মহাজীবনকথা

শ্রীরাম-কৃপাধন্য বাবা রঘুনাথদাস

স্বামী বিদেহাত্মানন্দ

[লেখকের হিন্দি প্রবন্ধ 'বাবা রঘুনাথদাস কী অদ্ভুত গাথা' প্রকাশিত হয়েছিল বিবেকজ্যোতি পত্রিকার এপ্রিল-মে ২০০২ সংখ্যায়। পরে, 'Prabuddha Bharata' পত্রিকার জুলাই ২০১১ সংখ্যায় প্রবন্ধটির ইংরেজি অনুবাদ 'Blessed Baba Raghunath Das' প্রকাশিত হয়। উক্ত দুটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে রচনাটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন **সুমনা সাহা**।]

সাল ১৮৮৬। ১৬ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিতে প্রবেশ করলেন। ভক্ত ও শিষ্যরা সকলেই শোকসন্তপ্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীতে 'মাস্টারমশাই' নামে খ্যাত, পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-রচয়িতা শ্রীম-র পক্ষেও দৈনন্দিন কাজকর্মে মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর স্কুলের কাজকর্ম থেকে ছুটি নিয়ে বৃন্দাবন, অযোধ্যা ও বারাণসী তীর্থ ভ্রমণমানসে বেরিয়ে পড়লেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম অযোধ্যা গিয়েছিলেন। অযোধ্যা পৌঁছে শ্রীম নানা মন্দির দর্শন ও পূজাদি সম্পন্ন করে সাধু-মহাত্মা দর্শনে বেরোলেন। তিনি শুনলেন, বাবা রঘুনাথ দাস নামে এক সন্ত পরমহংস অবস্থা লাভ করেছেন। শ্রীম গেলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আশ্রমে পৌঁছে তিনি দেখলেন বাবাজী শিষ্য-পরিবৃত হয়ে অকপট এক শিশুর মতো মহানন্দে বসে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির সংবাদ ইতিমধ্যেই বাবাজী জানতে পেরেছেন। তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করে সস্নেহে শ্রীম-র সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন, তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ''বেটা, কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? গুরুদেবের লীলাক্ষেত্রে ফিরে যাও। তাঁর ধ্যান-চিন্তা ও মহিমা কীর্তন করো।''[১]

স্বামী বিবেকানন্দ খুব সম্ভব শ্রীম-র মুখেই এই মহান সন্তের বিষয়ে শুনেছিলেন। পরিব্রাজক জীবনে, সম্ভবত ১৮৮৮ সালের জুলাই-আগস্ট মাস নাগাদ স্বামীজী বারাণসী হয়ে অযোধ্যায় পৌঁছন। সেইসময়ে বাবাজীর আশ্রমে পৌঁছে তিনি জানতে পারেন, মাস কয়েক আগেই বাবাজী মহাসমাধি লাভ করেছেন। স্বামীজীর সঙ্গে যদিও বাবা রঘুনাথ দাসের সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু তিনি তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছিলেন। পরে সিস্টার নিবেদিতার কাছে তিনি সেই প্রেরণাদায়ক জীবনের গল্প বলেন। নিবেদিতার নোট অবলম্বনে বাবাজীর জীবনকথা উপস্থাপিত করলাম।

''স্বামীজী যখন রঘুনাথ দাসের আশ্রমে পৌঁছলেন, তার দু-মাস আগেই বাবাজীর দেহান্ত হয়েছে। পূর্বাশ্রমে তিনি ব্রিটিশরাজের অধীনে সেনাশিবির রক্ষার কাজ করতেন এবং সচ্চরিত্র ও বিশ্বস্ততার জন্য ঊর্ধ্বতন অফিসারদের বিশেষ স্নেহভাজনও ছিলেন। একরাত্রে তাঁর কানে এল, রামনাম করতে করতে একটি কীর্তনের দল চলেছে। তিনি কর্তব্যকর্মে অবহেলা করতে চাননি, কিন্তু 'জয় বোলো রামচন্দর কি জয়' ধ্বনি তাঁকে পাগল করে তুলল। তিনি নিজের সৈনিকের পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র সমস্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কীর্তনের দলে ভিড়ে গেলেন।

''বেশ কিছুদিন এইরকম চলল। অবশেষে একদিন সেনাধ্যক্ষের (Colonel) কাছে খবর গেল। তিনি রঘুনাথ দাসকে ডেকে পাঠালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, যা শোনা যাচ্ছে তা সত্য কি না এবং এর শাস্তি সে জানে কি না। উত্তরে রঘুনাথ দাস জানালেন, এই অপরাধের সাজা তিনি খুব ভাল করেই জানেন, তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে। সেনাধ্যক্ষ বললেন, 'ঠিক আছে, এখন তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। এই প্রথমবার তোমাকে মাফ করলাম, কিন্তু আবার এরকম ব্যাপার ঘটলে কিন্তু শাস্তিভোগ করতে হবে।'

''সেইরাত্রে, আবার প্রহরারত রঘুনাথের কানে এল রামনাম কীর্তন। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেও সেই অপ্রতিরোধ্য টান অস্বীকার করতে পারলেন না। অবশেষে ভাগ্যের হাতে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে কীর্তন-দলের সঙ্গে সারারাত ভজনে মেতে রইলেন।

''রঘুনাথের উপর সেনাধ্যক্ষের এতটাই ভরসা ছিল যে, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ, এমনকী রঘুনাথের নিজমুখে অপরাধ স্বীকার করা সত্ত্বেও, তাঁর পক্ষে তা সত্য বলে মেনে নেওয়া কঠিন ছিল। তাই নিজের চোখে দেখবেন বলে গভীর রাত্রে তিনি শিবিরে উপস্থিত হলেন। রঘুনাথকে স্বস্থানে দেখে তিনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বললেন, একবার নয়, পরপর তিনবার। তখন সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হয়ে সেনাধ্যক্ষ নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

''সকালবেলা রঘুনাথ দাস এসে হাজির। তিনি নিজের অপরাধ স্বীকার করে অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়ে কাজে ইস্তফা দিতে চান। কিন্তু সেনাধ্যক্ষ তাঁর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে নারাজ। তিনি স্বচক্ষে যা দেখেছেন, নিজের কানে যা শুনেছেন—সেসব বললেন রঘুনাথকে।

''রঘুনাথ বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি সমস্তই বুঝলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং তাঁর এই নগণ্য ভৃত্যের হয়ে নিজে প্রহরীর কর্তব্য পালন করেছেন! অর্থাৎ প্রকৃত অর্থেই রঘুনাথের স্বকর্তব্য পালনে ত্রুটি হয়েছে। তিনি মনস্থির করে ফেললেন—প্রভু রামচন্দ্র যদি তাঁর সামান্য সেবকের জন্য এত কষ্টস্বীকার করতে পারেন, তাহলে তিনিও রামচন্দ্র ভিন্ন অপর কারও দাসত্ব করবেন না। অতএব চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার সংকল্প করে পদত্যাগ করার জন্য কর্তৃপক্ষকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

''তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করে সরযূ নদীর তীরে বাস করতে লাগলেন। লোকে তাঁকে মূর্খ মনে করত। কিন্তু তাঁর শক্তি ছিল অসামান্য। প্রতিদিন তিনি হাজার হাজার মানুষকে ভোজন করাতেন। পরে দোকানি তার হিসাব নিয়ে উপস্থিত হলে রঘুনাথ দাস বলতেন, 'হুম্, তুমি বলছ হাজার টাকা খরচ হয়েছে? দেখি, কী করা যায়। একমাস হল, আমার হাতে টাকাপয়সা কিছুই আসেনি। মনে হচ্ছে, কালই হাতে কিছু টাকা আসবে।' আর তা-ই হত, এর অন্যথা কখনও হত না।

''কেউ যখন রঘুনাথ দাসকে জিজ্ঞাসা করত, 'রামনাম কীর্তনের গল্পটা' সত্য কি না, তিনি বলতেন, 'ওসব জেনে লাভ কী?' প্রশ্নকর্তা হয়তো

বলত, ''আমি যে নিছক কৌতুহলবশত জানতে চাইছি, তা নয়। তবে আমি জানতে চাইছি যে এমন ঘটনা ঘটা সত্যই সম্ভব কি না!'' রঘুনাথ দাস তার উত্তরে বলতেন, 'প্রভুর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়'!''[২]

বাবা রঘুনাথ দাসের এই প্রেরণাদায়ক ঘটনাটি বলে স্বামীজী তাঁকে অমর করে গেছেন। এই সন্ত-পুরুষের জীবনের আরও কিছু ঘটনা সংকলিত হয়ে 'শ্রীরঘুনাথ দাস' নামে হিন্দি ভাষায় একটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে কোনও কোনও ঘটনা স্বামীজীর বর্ণনা থেকে ভিন্ন হলেও বইটি থেকে কিছু অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায়।

লক্ষ্ণৌ থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার উত্তরে পৈন্তিপুর নামে এক গ্রামে, ১৮৩৪ সালের বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে, বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে বাবা রঘুনাথ দাসের জন্ম। পিতার নাম দুর্গাপ্রসাদ। শৈশব থেকেই রঘুনাথের দয়ার প্রাণ। ক্ষুধার্ত, অসহায় মানুষ দেখলেই তিনি বাড়িতে নিয়ে আসতেন এবং তাদের পেট ভরে খাওয়ানোর জন্য মায়ের কাছে আবদার করতেন। যৌবনে তিনি নিত্য ব্যায়ামাদি করতেন এবং কুস্তিতে পারদর্শী হয়েছিলেন। রাইফেল চালনায়ও তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। অধুনা লক্ষ্ণৌ-এর অন্তর্গত সৈনিকপুরি গ্রামের একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

একবার রঘুনাথের গঙ্গাতীরে সাধনভজন করার সাধ হল। তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা দক্ষিণমুখে নদী অভিমুখে চলতে শুরু করলেন। পথে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি সরলভাবে সবই বললেন। বন্ধুদের মারফত খবর পেয়েই বাড়ির লোকেরা এসে তাঁকে জোর করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তরুণ রঘুনাথ তাঁদের বললেন, তিনি অন্যান্য অনেকের মতোই কেবলমাত্র পুণ্যতোয়া গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলেন। পরিবার একটি শর্তে সম্মতি দিলেন—তাঁর ভাইপো মথুরাপ্রসাদকে সঙ্গে নিতে হবে। তিনি সেইমতো ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে পুনরায় যাত্রা করলেন। চলতে চলতে তাঁরা যখন গুরুন্ডা গ্রামে পৌঁছলেন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাই সে-রাতে তাঁরা সেখানেই বিশ্রাম নিতে মনস্থ করলেন। রাত্রের আহারের পর মথুরাপ্রসাদ বিছানায় শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু রঘুনাথ দাস ধ্যানে বসলেন।

শোনা যায়, মাঝরাতে যখন তাঁর একটু তন্দ্রা এসেছে, তখন স্বপ্নে তিনি হনুমানজীর দর্শন পান। হনুমানজী বললেন, ''রঘুনাথ, লক্ষ্ণৌ চলে যাও। সেখানে ওয়াজিদ আলির সেনাদলের সেনাপতি রবার্ট সাহেব। সেখানে নিত্য রামায়ণ গান হয়, তোমার খুব ভাল লাগবে।'' স্বপ্নে পাওয়া নির্দেশানুসারে রঘুনাথ লক্ষ্ণৌ-এর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন এবং অল্প খোঁজাখুঁজির পরেই সেনাপতি রবার্টের শিবিরের সন্ধান পেলেন। সেই শিবিরের অধিকাংশ সৈন্যই ছিল ধার্মিক প্রকৃতির। একজন তাঁকে সেনাধ্যক্ষের কাছে নিয়ে গেল। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফৌজের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। ভাইপো মথুরাপ্রসাদকে একজন বিশ্বস্ত সৈনিকের সঙ্গে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। এর কিছুদিনের মধ্যেই কুচকাওয়াজের সময় রঘুনাথ কর্তৃপক্ষের নজর কাড়লেন এবং শীঘ্রই তাঁর পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হল।

একবার রঘুনাথ দাস কয়েকজন সৈনিক বন্ধুর সঙ্গে ছুটি নিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। তখন জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাস হবে। তাঁরা প্রয়াগে গিয়ে অনেক সাধুসন্ত দর্শন করলেন। মৌনব্রতধারী বলদেব দাসজীর প্রতি তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হলেন। তিনি রঘুনাথকে পবিত্র 'শ্রীরাম' মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তাঁর নাম দিলেন 'রঘুনাথ দাস'। ফৌজে থাকাকালে আর একবার তিনি শোনেন লক্ষ্ণৌ শহরে কয়েকজন সন্তের আগমন হয়েছে। পবিত্র সাধুসঙ্গে জীবন

ধন্য করতে রঘুনাথ ছুটলেন। আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে তিনি এমন ডুবে গেলেন যে ডিউটির নির্দিষ্ট সময়ের কথা একেবারে ভুলে গেলেন। রঘুনাথকে সাধুসঙ্গে মগ্ন দেখে স্বয়ং প্রভু রামচন্দ্র রঘুনাথের রূপ ধারণ করে তাঁর হয়ে ডিউটি করলেন। সকাল হতেই রঘুনাথের হুঁশ হল যে, তাঁর কর্তব্যে গাফিলতি হয়েছে। উদ্বিগ্ন চিত্তে শিবিরে ফিরে এসে তিনি বন্ধুদের সব কথা বললেন। কিন্তু তারা কেউ তাঁর কথা বিশ্বাসই করতে চাইল না। তাদের মধ্যে একজন তাঁকে রাত্রে ডিউটিতে পাঠিয়েছে, আর একজন তাঁর সঙ্গে ডিউটি বদলি করেছে, তৃতীয় ব্যক্তি সকালে তাঁর কাছ থেকে ডিউটি বুঝে নিয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে সবাই মিলে সাধুদের কাছে উপস্থিত হলেন। কিন্তু মহাত্মারা জানালেন যে, রঘুনাথ দাস সারারাত তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন এবং সকালে চলে গেছেন। সেখানকার একজন সাধু সব শুনে মন্তব্য করলেন, ''এসবই শ্রীরামের লীলা, ভক্তের ছদ্মবেশে শ্রীরাম নিজেই ভক্তের হয়ে ডিউটি পালন করেছেন।'' রঘুনাথ ভাবলেন, ভগবানকে যখন তাঁর জন্য এত কষ্টস্বীকার করতে হয়েছে, তখন তাঁকে আরও সচেতন হতে হবে।

শিবিরে বহু সৈনিক একত্রে নিত্য 'রামচরিতমানস' গান করতে সমবেত হত। তাদের মধ্যে অনেকেই রঘুনাথকে বারংবার পীড়াপীড়ি করতে লাগল, তিনি যাতে পবিত্র 'রামমন্ত্রে' তাদের দীক্ষা দেন। তাদের প্রবল আগ্রহ ও ভক্তির গভীরতা দেখে রঘুনাথকে রাজি হতেই হল।

একজন ইংরেজ অফিসার একবার রঘুনাথদের সেনাদল পর্যবেক্ষণ করতে আসেন এবং রঘুনাথের পারদর্শিতা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সেনাদলের প্রধান নিযুক্ত করেন। ক্রমে ভিঙ্গা ফোর্টের শাসক সম্বন্ধে কিছু অভিযোগ উঠতে থাকে এবং সে-খবর লক্ষ্ণৌতে পৌঁছয়। কর্তৃপক্ষ দুর্গ আক্রমণ করে দখল নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রঘুনাথ দাসের নেতৃত্বে সৈন্যদল প্রস্তুত হল এবং সাতদিনের পদযাত্রায় দুর্গে পৌঁছল। ভিঙ্গার রাজাও প্রচুর সুসজ্জিত সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন পালটা আক্রমণের জন্য। রঘুনাথের হঠাৎ মনে পড়ল, আজ শ্রীরামের পবিত্র জন্মদিবস—রামনবমী! তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে একটি নির্জন স্থানে বসে শ্রীরামের ধ্যানে ডুবে গেলেন। ইতিমধ্যে রাজা রঘুনাথদের সেনাদলের ওপর দ্বিগুণ সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভক্তের দুর্দশা দেখে শ্রীরাম রঘুনাথের রূপ ধরে নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন আর একা হাতে কামান দেগে শত্রুপক্ষের শত শত সৈন্য হত্যা করলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে তিনি রাজাকে বন্দি করলেন। রাজা তাঁর সমস্ত ধন-রত্ন সহ আত্মসমর্পণ করলেন, এবং পরাজয় স্বীকার করে সেই মর্মে একটি চিঠি লিখে দিলেন। এরপরেই ছদ্মবেশী শ্রীরাম অদৃশ্য হলেন।

গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে যা কিছু ঘটেছে রঘুনাথ কিছুই জানতে পারেননি। ধ্যান ভঙ্গ হলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস হত্যালীলা দেখে হতবাক হয়ে পড়লেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে এই ভয়ানক যুদ্ধ ঘটে গেছে ভেবে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও লজ্জিত হয়ে শিবিরে ফিরে এলেন। তাঁকে দেখামাত্রই সেনাধ্যক্ষ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর সৈন্যদের রক্ষা করার জন্য রঘুনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করলেন। রঘুনাথ আশ্চর্য হয়ে বললেন, ''কিন্তু আমি তো প্রশংসার মতো কোনও কাজ করিনি! বরং কর্তব্যে অবহেলা করার জন্য আমি অপরাধী। এইমাত্র আমার ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে, আর সোজা এখানে চলে এসেছি।'' সেনাধ্যক্ষ বললেন, ''তুমি প্রকৃতই বীর। আমি তোমাকে অসম সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখেছি। তোমার সাহসের জন্যই আমরা যুদ্ধ জিতেছি। অপরাধ বোধ করার কোনও কারণ নেই।

আমি নবাবের কাছে তোমার হয়ে সুপারিশ করব, যাতে তোমার আরও পদোন্নতি হয়।" সেনাদল বিজয়পতাকা উড়িয়ে কুচকাওয়াজ করে লক্ষ্ণৌ ফিরে গেল। কিন্তু রঘুনাথ দাস ব্যথিত হৃদয়ে দিবারাত্রি ভাবতে লাগলেন, "কেবলমাত্র আমার জন্য শ্রীরামকে মনুষ্যশরীর ধারণ করে এত কষ্টস্বীকার করতে হল। বরঞ্চ সেনাবাহিনির কাজ ছেড়ে দিয়ে শ্রীরামের সেবায় পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেই উচিত কাজ হবে।" লক্ষ্ণৌ পৌঁছেই তিনি পদত্যাগপত্র লিখে সেনাধ্যক্ষকে জমা দিলেন। কিন্তু তা গৃহীত হল না। অন্যান্য অফিসাররাও তাঁকে পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলেন। কোমল-প্রাণ রঘুনাথ তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। অগত্যা তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত আরও কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখলেন।

এর কিছুদিন পরে রঘুনাথের সেনাদলকে মীরাটে পাঠানো হল। সেই সময়ে তাঁর গুরু মৌনী বলদেব দাসজীও সেখানে অবস্থান করছিলেন। এতে একমাস ধরে রঘুনাথের পবিত্র গুরুসঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য হল। ফলে তাঁর বৈরাগ্য, ব্যাকুলতা আরও তীব্র হয়ে উঠল। রঘুনাথ যখন শুনলেন, গুরুদেব তীর্থযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তিনিও চাকরি ছেড়ে ঈশ্বরারাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। বন্ধুরা এবারেও তাঁকে আটকাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের কথায় আর কর্ণপাত করেননি। মীরাট থেকে সোজা হরিদ্বারে গিয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে নিজের বসন, একটি কুশাসন, জপের মালা ও একখণ্ড রামায়ণ সম্বল করে বাকি সমস্ত গঙ্গায় বিসর্জন দিলেন। মুক্তমনে, তৃপ্তপ্রাণে তিনি গঙ্গাতীর ধরে বারাণসীর দিকে যাত্রা করলেন। দিনরাত ডুবে রইলেন সাধনায়। পথে স্থানে স্থানে বিশ্রাম নিয়ে তিনি প্রায় একবছর পরে বারাণসী পৌঁছলেন। সেখানে তিনি থাকতেন রাজঘাটে। ক্রমে আধ্যাত্মিক উপদেশের জন্য তাঁর কাছে অনেকে আসতে শুরু করল।

মৌনী বলদেব দাস যখন জানতে পারলেন, রঘুনাথ বারাণসীতে আছেন, তিনি তাঁর এক শিষ্যকে পাঠালেন রঘুনাথকে অযোধ্যায় নিয়ে আসতে। রঘুনাথ অযোধ্যায় এসে গুরুসমীপে অবস্থান করে সাধন-ভজন করতে লাগলেন। অনেক বছর পর, হঠাৎ তাঁর নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ল। গুরুর অনুমতি নিয়ে তিনি তাঁর গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। গ্রামে পৌঁছে তিনি পিতার মৃত্যুসংবাদ পেলেন। আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের কাছে তিনি শ্রীরামের গৌরব-গাথা বর্ণনা করলেন। একদিন তাঁর মা বদরিনাথ তীর্থ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে রঘুনাথ কয়েকজন আত্মীয়ের সঙ্গে মাকে নিয়ে বদরিনাথ যাত্রা করলেন। যাত্রাপথে মা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি রঘুনাথকে কাছে ডেকে বললেন, "বাবা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করে তুমি ধন্য হয়েছ। আমার যে ভগবান বিষ্ণুর আলয় 'বৈকুণ্ঠ' লাভের বড় আশা! সে-আশা তুমি কি পূরণ করতে পার না?" মায়ের কথায় রঘুনাথের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি মাকে আশ্বাস দিলেন, "মা, তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে, তুমি নিশ্চয় বৈকুণ্ঠ লাভ করবে!"

মায়ের মৃত্যুর পর, রঘুনাথ অযোধ্যায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তাঁর স্ত্রীও তাঁর অনুবর্তিনী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর আগ্রহ দেখে রঘুনাথ তাঁকে সঙ্গে নিলেন এবং গুরুপত্নীর সেবায় স্ত্রীকে নিযুক্ত করে নিজে গুরুসেবা ও সাধন-ভজনে ডুব দিলেন। কিছুকাল পরে তাঁদের একটি পুত্র ও কন্যাসন্তান জন্মায়, কিন্তু তারা দীর্ঘজীবী হয়নি। কয়েকবছর পরে রঘুনাথের স্ত্রীও গত হলেন। শোকাভিভূত রঘুনাথ তাঁর মনপ্রাণ শ্রীরামের

সেবা-পূজায় অর্পণ করলেন। রঘুনাথের ধর্মপ্রসঙ্গ শুনতে বাসুদেব ঘাটে প্রত্যহ বহু লোক-সমাগম হতে লাগল। ভক্তসংখ্যা ক্রমে এত বেড়ে গেল যে স্থান-সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। রঘুনাথ তখন সরযূতীরে একটি আশ্রম নির্মাণ করে সেখানে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর ধর্মপ্রসঙ্গ সেখানেও শত-সহস্র ভক্তের চিত্তে শান্তিবারি সিঞ্চন করে চলল।

সেই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন রাজা মান সিংহ। কয়েকজন ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি তাঁকে গিয়ে নালিশ করল যে রঘুনাথ ক্রমশ অধিক পরিমাণ জমির দখল নিয়ে চলেছেন। রাজা তাঁকে একটি বার্তা পাঠালেন : ''তোমার যতটুকু জমির প্রকৃত প্রয়োজন, কেবল ততটাই নাও। বেশি জমি নিয়ে তুমি করবেই বা কী?'' রঘুনাথ দাস তার উত্তরে জানালেন : ''আমার প্রয়োজন কেবলমাত্র একটি কুঁড়েঘর। বাকি জমি ভক্তরা তাঁদের আস্তানা ও সাধন-ভজনের স্থান হিসেবে ব্যবহার করছেন। আপনার তাতে সম্মতি না থাকলে আমরা খুশিমনে এই স্থান ছেড়ে চলে যাব।'' শীঘ্রই তিনি বাসুদেব ঘাট ছেড়ে মড়না গ্রামে বসতি স্থাপন করলেন। অন্যান্য সাধু ও ভক্তগণও তাঁর অনুগামী হয়ে সেখানে চলে এলেন এবং প্রভুর পবিত্র নাম কীর্তন চলতে লাগল। রঘুনাথ চলে যাওয়ার পর রাজা মান সিংহের দারুণ মনোবেদনা উপস্থিত হল। তিনি বারংবার মড়না গ্রামে লোক পাঠিয়ে রঘুনাথকে ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষে রাজা নিজেই গেলেন তাঁকে অযোধ্যায় ফিরে আসার অনুরোধ জানাতে। এবার রঘুনাথ সরযূ নদীর মাঝখানে 'মাঞ্ঝা' দ্বীপে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর থাকার সমস্ত বন্দোবস্ত করে রাজা ফিরে গেলেন। নৌকাযোগে নদী পেরিয়ে বহু ভক্ত তাঁর সেই আশ্রমে এসে ভিড় করতে শুরু করল।

একবার, রেবার রাজা, একহাজার অনুচর সহ মাঞ্ঝায় এলেন বাবা রঘুনাথ দাসের সঙ্গে দেখা করতে। রঘুনাথের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে একুশ হাজার টাকা এবং তিনহাজার মিঠাই উপহার দিলেন। সেই মিঠাই সমস্ত সাধু ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করা হল এবং প্রত্যেককে এক টাকা প্রণামী দেওয়া হল। অবশিষ্টাংশ রেখে দেওয়া হল গরিবদুঃখীদের খাওয়ানোর জন্য। একদিন, ফৈজাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রঘুনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসে নৌকা থেকে নামার সময় পা পিছলে কাদাজলে পড়ে গেলেন। ভেজা কাপড়েই তিনি বাবাজীকে দর্শন করে জানালেন দ্বীপস্থ আশ্রমে আসতে ভক্তদের খুবই কষ্ট হয়। রাজার অনুরোধে আবার সরযূ-তীরে আশ্রম স্থানান্তরণের ব্যবস্থা হল।

কিশুনদাস নামে জনৈক সাধুর একবার সাধ হয় রঘুনাথ দাস বাবাজীর পরীক্ষা নেওয়ার। তিনি আশ্রমের ম্যানেজার পুরাণদাসকে সাহায্য করতেন। বাবাজীর অনুমতিক্রমে পুরাণদাস বদরিনাথ তীর্থ দর্শনে রওনা হওয়ার আগে কিশুনদাসের ওপর আশ্রমের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। সেই সময়ে একবার, রঘুনাথ অযোধ্যাবাসীকে ভোজন করাতে মনস্থ করলেন। কিশুনদাস দেখলেন, বাবাজীকে পরীক্ষা করার এই সুবর্ণ সুযোগ। রাঁধুনিরা যখন মিঠাই তৈরি করছে, সেই সময়ে তিনি গিয়ে অর্ধেক পরিমাণ ঘি লুকিয়ে ফেললেন। বাকি ঘি শেষ হয়ে গেলে ঘি কিনে আনতে একজনকে পাঠানো হল। সে কোথাও ঘি না পেয়ে খালি হাতে ফিরে এল। অনন্যোপায় হয়ে রঘুনাথ দাস আদেশ দিলেন, ''কুড়িটি ঘড়া নিয়ে সরযূ নদীর কাছে যাও, তাঁকে সব কথা জানাবে এবং অনুরোধ করবে যেন তিনি আমাদের ঘি ধার দেন। তারপর নদীর জল বিশটি ঘড়ায় ভরে নিয়ে আসবে।'' শিষ্যরা তাঁর আদেশানুযায়ী কাজ করল। নদীর জল ঘিয়ে পরিণত হল এবং রান্নায় তাইই দেওয়া হল। তারপর একদিন

সকালে রঘুনাথদাস সেই ধার শোধ করতে বিশ ঘড়া ঘি জোগাড় করলেন এবং সেইসমস্ত ঘি সরযূর জলে ঢেলে দিলেন। কিশুনদাস তো তাজ্জব বনে গেলেন, কিন্তু তবুও তাঁর সন্দেহ ঘুচল না এবং এরপরেও তিনি বাবাজীকে পরীক্ষা করার সংকল্পে অটল রইলেন।

১৮৭৭ সালে অযোধ্যায় এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। পথঘাট ক্ষুধার্ত শিশু, নরনারীর ক্রন্দনে বিষণ্ণ হয়ে উঠল। বহু গৃহস্থ ও সাধু রঘুনাথের আশ্রমে আশ্রয়লাভ করলেন এবং নিত্য আহার পেতে লাগলেন। একদিন ফৈজাবাদ থেকে রামদাস নামে এক বণিক বাবাজীকে দর্শন করতে এলেন। তিনি বাবাজীর পায়ে পড়ে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করলেন। বাবাজী তাঁকে আশ্রম থেকে টাকা নিয়ে শস্য কিনে প্রতিদিন তা আশ্রমে সরবরাহ করতে আদেশ দিলেন। এতে ক্ষুধার্ত মানুষেরও উপকার হবে এবং বণিকের অর্থাভাবও দূর হবে। বাবাজী তাঁকে শস্যের ব্যবসা শুরু করার জন্য এক হাজার টাকা অগ্রিম দিলেন। রামদাসও নিত্য আশ্রমে খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে শুরু করলেন। অতি শীঘ্রই তাঁর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠল এবং তিনি ফৈজাবাদের ধনী শস্যবিক্রেতাদের অন্যতম হয়ে উঠলেন। রঘুনাথ দাস কিশুনদাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন প্রত্যেকে দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আহার পায় এবং দুর্ভিক্ষের কালে কেউ যেন অভুক্ত না থাকে। তিনি কিশুনদাসকে এও বলে রেখেছিলেন যে তিনি যেন যথেষ্ট আটা, ডাল, চাল, ঘি ইত্যাদি সংগ্রহে আছে কি না—সেদিকে খেয়াল রাখেন। বাবাজীকে পরীক্ষা করার আর একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন কিশুনদাস। তিনি ফৈজাবাদে গিয়ে রামদাসের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মনে সন্দেহের বিষ ঢুকিয়ে দিলেন, বললেন, অদূর ভবিষ্যতে বাবাজীর রামদাসের ধার শোধ করার মতো অবস্থা থাকবে না। অতএব, তিনি যেন আশ্রমে ধারে খাদ্যশস্য পাঠানো বন্ধ করেন। রামদাস তাঁর কথা বিশ্বাস করে সেই মতো কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ভাণ্ডারের শস্য প্রায় শেষ হয়ে এলে কিশুনদাস রঘুনাথদাস বাবাজীকে জানালেন যে, সেই বণিক তাঁর বকেয়া টাকা না মেটানো পর্যন্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে পারবেন না।

বাবা রঘুনাথ কিন্তু বিষয়টিকে অন্যভাবে নিলেন। তাঁর মনে হল, ধনী ব্যক্তির দানের ওপর নির্ভর না করে তাঁর সম্পূর্ণ ভাবে শ্রীরামের ওপরই নির্ভরশীল হওয়া উচিত। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন ও প্রার্থনায় ডুবে রইলেন। দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হল, ক্ষুধার্ত মানুষেরা অন্ন পেল না—কারণ ভাণ্ডার শূন্য। সন্ধ্যার সময় একজন শিষ্য বাবাজীর জন্য একবাটি পায়েস নিয়ে এলে বাবাজী তা গ্রহণ করলেন না, কারণ অতিথিরা তখনও অভুক্ত। বাবাজী ধ্যানে কিশুনদাসের কীর্তিকলাপ সমস্তই জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁকে কিছুই বললেন না। মধ্যরাত্রে, যখন অভুক্ত অতিথিরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, বাবাজী স্বপ্ন দেখলেন—মা লক্ষ্মী এসেছেন। তিনি দুটি থলি রঘুনাথের কাছে রেখে অদৃশ্য হলেন। বাবাজী কিশুনদাসকে ডেকে থলিগুলি খুলতে আদেশ করলেন। হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ সেই থলি খুলে কিশুনদাস ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বুঝলেন, বাবাজীকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করে তিনি গুরুতর অপরাধ করেছেন। তিনি বাবাজীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে নিজ কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বাবাজী বললেন, ‘‘রামদাসের কাছে যাও, তাঁর বকেয়া পাওনা শোধ করে তাঁকে ক্ষুধার্ত মানুষের আহারের ব্যবস্থা করতে বলো।’’ কিশুনদাস কালবিলম্ব না করে ফৈজাবাদ রওনা হলেন। তাঁর মুখে বাবাজীর আশ্চর্য বিভূতির কথা শুনে রামদাস ভয়ে কাঁপতে লাগলেন এবং এতগুলি সাধু ও ভক্তকে সারাদিন ক্ষুধার জ্বালা সহ্য

করতে হয়েছে শুধু তাঁরই জন্য—একথা ভেবে তিনি দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে কিশুনদাস আশ্রমে ফিরে এলেন, খাবার তৈরি হল, অভুক্ত মানুষ পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করল।

একবার দক্ষিণ ভারত থেকে এক ধনী বৃদ্ধা এলেন অযোধ্যায়। সরযূতে স্নান করে তিনি একটি জীর্ণ-ছিন্ন বসন পরে হাতে তাম্র কমণ্ডলু নিয়ে একজন প্রকৃত সাধুর সন্ধানে বেরোলেন। নানা আশ্রমে গিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, ''আমার কেবল এই তাম্রপাত্র সম্বল, এটি বিক্রি করে সেই অর্থে আমি অযোধ্যার সাধুদের ভোজন করাতে চাই।'' তাঁর কথা শুনে সকলে হাসতে লাগল এবং কেউ কেউ তাঁকে পাগল ভেবে তাড়িয়ে দিল। অবশেষে তিনি বাবা রঘুনাথ দাসের আশ্রমে পৌঁছে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সেই তাম্রপাত্র দেখিয়ে তাঁর মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। বাবাজী একজনকে সেই পাত্র বিক্রি করে খানিকটা হিং কিনে আনতে বললেন। সেই হিং তরকারিতে মিশিয়ে তিনি সবাইকে খাবারের সঙ্গে পরিবেশন করতে আদেশ দিলেন। তরকারির অপূর্ব স্বাদে সকলে সেই বৃদ্ধার নামে ধন্য ধন্য করতে লাগল। পরে সেই বৃদ্ধা নিজের আস্তানায় ফিরে গেলেন এবং দামি পোশাক পরে, পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে আবার আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তিনি বাবাজীকে কুড়ি হাজার টাকা প্রণামী দিলে, বাবাজী সেই টাকায় আরও তিনদিন ধরে ভোজের আয়োজন চালানোর আদেশ দিলেন। সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়ে বৃদ্ধা ফিরে গেলেন।

সাধু, ভক্ত ও অধ্যাত্ম-পিপাসু মানুষের সংখ্যা ক্রমে বাড়তে লাগল, আশ্রমে স্থানাভাব দেখা দিল। বাবাজী ভাবলেন, যদি সরযূমাতা নিজের স্থান থেকে কিছুটা সরে গিয়ে জায়গা দেন, তবে সমস্যার সমাধান হয়। কিছুক্ষণ শ্রীরামের ধ্যান করে তিনি আখের রস ও দুধ চাইলেন। তারপর নদীতীরে গিয়ে সরযূমাকে সে সমস্ত নিবেদন করলেন ও ভক্তি সহকারে তাঁর স্তব করতে লাগলেন। রাত্রে দক্ষিণ ভাগ শুষ্ক রেখে নদী উত্তর দিকে সরে যেতে থাকল। সকালের আগেই সরযূমাতা প্রায় দু-মাইল জমি ছেড়ে দিলেন। বিস্মিত মানুষ আনন্দে অধীর হয়ে মহোৎসাহে রামগুণগান কীর্তন করতে লাগল।

একবার গোন্ডার রাজা শ্রীকৃষ্ণ দত্ত সস্ত্রীক বাবাজীকে দর্শন করতে এলেন। তাঁরা প্রণাম করলে বাবাজী আশীর্বাদ করে কুশল-প্রশ্ন করলেন। রাজা দেখলেন, সমস্ত কুঁড়েঘরের চালে খড় ও পাতার ছাউনি দেওয়া। তিনি সাধুদের জন্য একটি নতুন মন্দির, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর এবং বসবাসের ঘর তৈরি করে দেওয়ার প্রস্তাব জানালেন। বাবাজী সম্মতি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার উদ্দেশ্যে রাজা হাজার টাকা বাবাজীর পদতলে নিবেদন করলেন। পবিত্র তিথিতে ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানের দিন স্থির হল। সেই দিন আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজা তাঁর প্রাসাদে ফিরে গেলেন। পরে বাবাজী ভাবলেন, ''আমার প্রার্থনায় সরযূ মাতা এই জমি দান করেছেন। এমনও তো হতে পারে যে, আমার অনুপস্থিতিতে তিনি আবার তাঁর জমি ফিরিয়ে নেবেন। সেক্ষেত্রে, নতুন মন্দির নির্মাণ কাজে রাজার অনুদানের অর্থ নষ্ট হবে।'' একইসঙ্গে, তিনি এমন একটি উপায়ে রাজার অর্থের সদ্ব্যবহার করতে চাইলেন, যাতে রাজার নাম অমর হয়ে থাকে। তিনি ম্যানেজার মহারাজকে ডেকে সাধুসন্ত ও দরিদ্র মানুষের ভোজনের আয়োজন করতে বললেন। বাজার থেকে গরুর গাড়ি বোঝাই করে খাদ্যশস্য এল। বাবাজীর ডাক পেয়ে রাজা ও রানি সভাসদদের সঙ্গে করে আশ্রমে এলেন। আশ্রম সাধু ও ভক্তে পরিপূর্ণ। আহারের আয়োজন সম্পূর্ণ। অতিথিরা যখন খেতে শুরু করলেন, বাবাজী রাজাকে বললেন, ''দেখ, সাধুর উদর হল পবিত্র জমি, তাঁর হৃদয় স্বর্গসম স্থান, যে খাদ্য তাঁদের নিবেদিত হয়, তা হল নির্মাণ-সামগ্রী, যা

মন্দিরের ভিত্তি সুদৃঢ় করে তাকে চিরস্থায়ী করবে। এই রকম একটি মন্দির চিরকাল থাকবে।'' ভোজন সমাপ্ত হওয়ার পর রাজা আবার করজোড়ে বাবাজীর কাছে মন্দির নির্মাণের প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু কেবল ইট-কাঠের মন্দির নির্মাণে বাবাজীর সম্মতি ছিল না। তখন রাজার সেই ভাবটি মনে ধরল। তিনি বাবাজীকে আরও সাতদিন ধরে ওই ভোজের অনুষ্ঠান চালিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। বাবাজীর অনুমতি পেয়ে সাধুসন্তগণ সাতদিন ধরে অযোধ্যায় থেকে শ্রীরামনাম কীর্তনে মেতে রইলেন। বাবাজীর কৃপা লাভ করে রাজা-রানি উভয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

তখন শীতের সময়। বাবাজী সাধুদের মধ্যে শত শত কম্বল বিতরণ করলেন এবং আগুন পোহানোর ব্যবস্থাও করলেন। একদল সাধু বাবাজীর আশ্রমে এসে স্থির করলেন, সেখানে কিছুদিন থাকবেন। দলপতি হরিদাসকে বাবা রঘুনাথ দাস বললেন, ''আজ আমার আপনাদের পছন্দের খাবার খাওয়াতে ইচ্ছা হচ্ছে।'' হরিদাস বললেন, ''বেশ তো, আপনার যদি তেমন ইচ্ছা হয়, তাহলে চিনি আর তরমুজ ভোগ লাগান, সঙ্গে মালপোয়া পেলে তো আর কথাই নেই!'' সকলে অবাক হল—এই অসময়ে তরমুজ কোথায় পাওয়া যাবে! পরিষ্কার বোঝা গেল কেবল রঘুনাথ দাসকে পরীক্ষা করার জন্যই হরিদাস তরমুজ খেতে চাইলেন। কিন্তু বাবাজী কয়েকজনকে তরমুজের খোঁজে পাঠিয়ে নিজে শ্রীরামের ধ্যানে ডুবে গেলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে কয়েকজন মাঝি তরমুজ নিয়ে আশ্রমে হাজির হল। তারা করজোড়ে বলল, ''আমরা আশ্বিন মাসে তরমুজের বীজ রুয়েছিলাম, ভগবানের কৃপায় তাতে এখন ফল ধরেছে। অসময়ের ফল, তাই আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করতে এসেছি!'' বাবাজী শ্রীরামের কৃপাস্বরূপ সেগুলি গ্রহণ করে তাদের আশীর্বাদ করলেন। তখন হরিদাস ও অন্যান্য সাধুদের ডেকে তিনি বললেন, ''কৃপালু শ্রীরাম এই তরমুজগুলো পাঠিয়েছেন, দয়া করে আপনারা চিনি সহযোগে এগুলো গ্রহণ করুন।'' হরিদাস তখন স্বীকার করলেন, ''আপনার আশ্রমে আসার পথে আমরা শুনেছি যে, আপনি সর্বদাই সাধুদের তাঁদের ইচ্ছামতো ভোজন করান। তাই আপনাকে পরীক্ষা করার জন্যই আমরা এই অসময়ের ফল খেতে চেয়েছিলাম। আমাদের ক্ষমা করুন ও দয়া করে এখন প্রয়াগের উদ্দেশে যাত্রা করার অনুমতি দিন।'' বাবাজী তাঁদের উষ্ণ বিদায়-সংবর্ধনা জানিয়ে প্রচুর টাকাপয়সা, বস্ত্র, বাসনপত্র ইত্যাদি দান করলেন। তাঁরাও 'সন্ত শিরোমণি রঘুনাথ দাস কি জয়' ধ্বনি দিতে দিতে যাত্রা করলেন।

একদিন বাবাজীর সঙ্গে ঊর্ধ্ববাহু এক সাধুর সাক্ষাৎ হল। শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পর বাবাজী জানতে চাইলেন, কেন তিনি সর্বদা ঊর্ধ্ববাহু হয়ে রয়েছেন। সাধুটি বললেন, ''এই কলিযুগে, কায়িক তপস্যা না করে কেউ ঈশ্বরোপলব্ধি করতে পারে না। আমি ঈশ্বরের তুষ্টিবিধানের জন্য এই সমস্ত দৈহিক কষ্টস্বীকার করে চলেছি।'' সেকথা শুনে বাবাজী বললেন, ''কিন্তু ভগবান যখন ভক্তিপ্রেমেই সন্তুষ্ট হন, এইসমস্ত কায়ক্লেশের কী প্রয়োজন?'' সাধুটি বললেন, ''হ্যাঁ, সত্য বটে, কিন্তু তাঁর প্রতি প্রেম-ভক্তি লাভ করব কীভাবে?'' বাবাজী উত্তর দিলেন, ''ভগবানের প্রেমের শক্তি আপনার হাত স্বস্থানে নামিয়ে আনবে।'' সাধুটি তখন বললেন, ''মহারাজ, দশ বছর কেটে গেল, আমার কাঁধের মাংসপেশিতে রক্ত জমাট বেঁধে এমন শক্ত হয়ে গেছে যে, হাত আর সহজে স্বস্থানে নামবেই না। কিন্তু আপনি আপনার ঈশ্বর-প্রেমের শক্তি দিয়ে আমার হাত স্বাভাবিক অবস্থায় এনে দিতে পারেন। দয়া করে এই যন্ত্রণা থেকে আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুক্তি দিন।'' বাবাজী মুদিত নয়নে শ্রীরামের ধ্যানে মগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভুর নামগান

করতে করতে তিনি চোখ খুলে বললেন, ''বাছা! এখন তুমি তোমার হাতদুটো নামিয়ে নাও। ঈশ্বর প্রেমের মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দাও।'' উপস্থিত সকলকে অবাক করে দিয়ে সত্যই সেই সাধুটির হাত নেমে এল স্বাভাবিক অবস্থানে, হাত দুটি আগের মতোই সুগঠিত হল। তখন বাবাজীর চরণে লুটিয়ে পড়ে সেই সাধুটি কৃতজ্ঞচিত্তে করুণ স্বরে বলতে লাগলেন, ''হে প্রভু, আজ আমি ধন্য! তুমি আমার অজ্ঞান অন্ধকার ঘুচিয়ে জ্ঞানের আলো দেখিয়েছ!'' বাসনা ও তার নিবৃত্তি সম্বন্ধে বাবাজীর চৈতন্যদায়ী উপদেশে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে তিনি চলে গেলেন।

১৮৮৮ সালের পৌষ মাসে বাবাজী তাঁর মর্ত্যতনু ত্যাগ করেন। সেই সময় থেকেই প্রত্যেক বছর ওই দিনে বাবা রঘুনাথ দাসের স্মৃতির উদ্দেশে সম্মান জানাতে বহু সাধু, অধ্যাত্মপিপাসু ভক্ত ও দরিদ্র মানুষদের ভোজন করানো হয়। একবার বাবাজীকে পুরাণদাস জিজ্ঞেস করেছিলেন, ''সাংসারিক বন্ধনে কে বাঁধা পড়ে?'' সন্ত রঘুনাথ উত্তর দিয়েছিলেন, ''শোক, আসক্তি, দুঃখ, সুখ এবং ভাললাগা—এ সমস্তই মায়ার সৃষ্টি। এগুলি সত্য নয়, স্বপ্নের মতো। মায়ার দুটি রূপ—বিদ্যা ও অবিদ্যা। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশস্বরূপ এবং তা অবিনাশী। বন্ধন ও মুক্তির অনুভব জীবের পক্ষে। মনুষ্যদেহে জীবাত্মা, পরমাত্মা উভয়েরই অবস্থান। যেন একই গাছে বসা দুই পাখি—একটি পাখি গাছের ফল খাচ্ছে, অন্যটা সাক্ষীস্বরূপ। কর্মফল অনুসারে জীব সুখদুঃখ ভোগ করে। কিন্তু সাক্ষীস্বরূপ পরমাত্মা এ সমস্ত থেকে মুক্ত। জীবই অবিদ্যার ফাঁদে পড়ে বদ্ধ হয়।''

তিনি ছিলেন পরমহংস সাধু। পরমহংসের দেহত্যাগ সম্বন্ধে তিনি বলতেন, ''সন্ত যে কোনও স্থানেই দেহত্যাগ করতে পারেন, তা নিচুজাতের ঘরেই হোক বা পথে-প্রান্তরেই হোক। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে শরীর ছাড়তে পারেন অথবা দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী হয়ে রোগভোগ করতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে বিদেশ-বিভুঁই-এ তাঁর মৃত্যু হতে পারে কিংবা গঙ্গাতীরে। স্বয়ং শ্রীরাম যাঁর কপালে মুক্তি লিখে দেন, মুক্তি তাঁর পিছু পিছু ফেরে।'' ✠

তথ্যসূত্র

১। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, হিন্দি অনুবাদ : ঈশ্বরদেবী গুপ্তা, *শ্রীম দর্শন*, (চণ্ডীগড়, শ্রীম ট্রাস্ট, ১৯৯০), খণ্ড ১৬, ৭।১৮৮

২। *Complete Works of Sister Nivedita* (Advaita Ashrama: Kolkata 2006), Vol 5, 1. 131-3.

৩। Pandit Ramnarayan Pandey, *Sri Raghunath Das* (Ayodhya : Swami Ramdasji Paramahamsha Badi Chhavni, 1957)

ভ্রম সংশোধন

গত মে-জুন ২০১৬ সংখ্যায় 'দেবীত্রয়ী' প্রবন্ধে ২৮ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ২৮ ও ২৯তম পঙ্‌ক্তিতে 'অজ্ঞাতবাদ' স্থলে 'অজাতবাদ' হবে।